নয়া বউ

মনজুর সা'দ

প্রয়াস প্রকাশন

লেখকের কথা

নয়া বউ। আমার তৃতীয় রম্য গল্পগ্রন্থের নাম। একটি ফুলের মৃত্যু ও তোমার ঐ আঁচলখানি'র যে ভালোবাসা পাঠক আমাকে দেখিয়েছেন। আমি চিরকৃতজ্ঞ। আপনাদের দুআ ও ভালোবাসা আছে দেখেই আমি এগিয়ে যাওয়ার অসীম সাহস পাই বুকে। আমার আত্মবিশ্বাস, এই রম্য বইটার জন্য আরও বেশি ভালোবাসা দেখাবেন। এবং মন থেকেই গ্রহণ করবেন।

এই বইটিতে তেরোটি গল্প আছে। গল্পগুলো চমৎকার। সহজ-সাবলীল ভাষায় লেখা। পড়তে শুরু করলে শেষ হওয়া অবধি উঠবেন বলে মনে হচ্ছে না। বাজারে আরও কত-শত রম্য রচনার বই আছে। আমি বেশ কিছু পড়েছি। কী ভয়ঙ্কর অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ চয়ন বাবা! পড়তে গেলে মন ভালো হওয়ার বদলে আরও খারাপ হয়ে যায়। অভিধান থেকে শব্দ খুঁজে খুঁজে বের করে বুঝতে হয়। হাসি না এলে কাতুকুতু দিয়ে নিজেকে হাসাতে হয়। এই বইয়ের গল্পগুলো পড়লে অন্তত কাতুকুতু দিয়ে নিজেকে হাসাতে হবে না, এইটুকুন বলে রাখছি।

বাদ বাকী পাঠকের আদালতে ছেড়ে দিলাম।

দাঁড়ান, মূল গল্প বলবার আগে ছোট্ট একটা গল্প বলে নিই। বইটা কাকে উৎসর্গ করব এ নিয়ে দোটানায় পড়ে গেলাম। আম্মাকে বললাম, তৃতীয় বইয়ের উৎসর্গ পত্রে তোমার নাম দিতে চাই। তোমার কাছে অনুমতি নিতে এলাম। আম্মা বিছানার চাদর ঝাড়ু দিতে দিতে বললেন, অনুমতি নেওয়ার কী আছে। উৎসর্গ পত্রে নাম থাকবে এটা ত খুশির খবর। আমি হাত কচলাতে কচলাতে বললাম, না মানে, হাতটা খালি খালি লাগতেছে ত তাই ভাবলাম যদি কিছু দাও আর কি ।

'টাকা নেওয়ার নতুন ধান্দা শুরু করতাছোস, না? হাতে এটা কী দ্যাখছিস?'

'হু। পরিচিত জিনিস। বিছানা পরিষ্কার করার কাজে বেশিভাগ ব্যবহার হয়ে থাকে। পিঠেও ব্যবহার হয় তবে খুবই কম। আচ্ছা, এখন অন্য কারো কাছে যাই। কাউকে কিছু বলার দরকার নাই। তুমি মনোযোগ দিয়ে তোমার কাজ করতে থাকো। '

বড়াপুর কাছে গেলাম। চেয়ার টেনে মিষ্টি করে বললাম, আপু, তোমার শাড়িটা না খুব সুন্দর। জোস লাগতাছে তোমারে।

অন্য কারো গায়ে ঠিকমতো মানাবে বলে মনে হচ্ছে না। এত সুন্দর শাড়ি কোত্থেকে কিনলা?

'কী বলতে আইছোস ওটা বলে বিদায় হ। আমার হাতে মেলা কাজ পইড়ে আছে। তোর পাম শোনার এত টাইম নাই।'

আমি কাঁদো কাঁদো গলায় বললাম, 'তাই? আচ্ছা ঠিকাছে, আমি খালি মানুষেরই পাম-ই দেই? এতদিনে এটাই মনে হল তোমার কাছে? হায়রে রক্তের সম্পর্কের ভাই-বোন! আমি কত আপন ভাবতাম আর আজ..! আমি এই জীবন রেখে কই যামু এখন। ভারী ভারী নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, আহ, কষ্ট পাইলাম কষ্ট, ভীষণ কষ্ট!

'আচ্ছা ঠিকাছে। স্যরি। কী বলবি তাড়াতাড়ি বল।

ঝেড়ে কেশে গলা পরিষ্কার করে বললাম, আসলে আপু, মস্ত বড় একটা সু-সংবাদ আছে। তুমি শুনলে মাটিতে পড়ে যেতে পারো। শক্ত করে আগে চেয়ার ধরে বসো। তারপর বলি।

'ভূমিকা টুমিকা বাদ দিয়ে সোজা রচনায় আয়। খালি মেয়ে মানসের মতো ন্যাকামি করে।'

'দুলাভাই তো মাশাল্লাহ ভালোই ইনকাম টিনকাম করছে। দিনকাল ভালোই যাচ্ছে। সুনাম সুখ্যাতি যা অর্জন হয়েছে আর দরকার কী বলো? মনে করে তোমাদের নাম বইটই এসে গেল। সেই বই ছাপা হলো দুই হাজার কপি। দুই হাজার মানুষ তোমাদের নাম পড়ে খালি দুআ করতে থাকল। আর তোমরা সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব দুনিয়া ও আখেরাতে পেতেই থাকলা। কেমন অনুভূতি হবে, ভাবতে পারছ? খুশি হবে না? হাত কচলাতে কচলাতে বললাম, তৃতীয় বইয়ের উৎসর্গ পত্রে তোমাদের নাম দিতে চাইতাছি। একদম মন থেকে, ভালোবেসে, কোনো লুকোচুরি নাই। একটু অনুমতির প্রয়োজন, এজন্যই এলাম আর কি।

'হুম। খুশির সংবাদ। শুনে খুশি হলাম। যা অনুমতি দিলাম।'

'যাক, আলহামদুলিল্লাহ। মিয়া বিবি রাজি, তো কেয়া করেগা কাজী! দেরি না করে তাড়াতাড়ি চার-পাঁচ হাজার টাকা দাও। এত কম দামে উৎসর্গ পত্রে কারো নাম দেওয়ার নিয়ম নাই। আমি তবু দিতাছি। মায়ের পেটের বোন বলে কথা!' আপু আমার কথাবার্তা শুনে হাসতে হাসতে শেষ। ওনাকে ওই অবস্থায় রেখে আমি টাকা নিয়ে চলে এলাম।

আমি চাই মানুষ হাসুক। হাসতে হাসতে বেহুঁশ হয়ে যাক। হুঁশ ফিরলে আবারও হাসুক। হাসতে হাসতে খাট ভেঙে পড়ে যাক। পড়ে হালকা করে মরে যাক। তবু একটুখানি হাসুক। আমার না মানুষের হাসিমুখ দেখতে ভালো লাগে। মানুষের দুঃখ দেখতে বড্ড দুঃখ লাগে!

পরিশেষে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন বইয়ের লেখক, পাঠক/পাঠিকা, প্রকাশক এবং বইটি লিখতে যাঁরা আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করেন। আমিন!

লেখক

মনজুর সা'দ
কসবা, শেরপুর
১৯ আগস্ট ২০২৩

সূচিপত্র

শাড়ি ৭

এই মেঘ এই রোদ ১১

ধাক্কা ১৬

বইচোর ১৭

বাচ্চাটা আমার না ২০

কাঁচা মরিচের ঝাঁজ ২৩

এক খিলি পান ২৫

বিয়ের ফুল ২৮

অটোগ্রাফ ২৯

বকশিশ ৩৩

নেক নজর ৩৭

সুখটান ৪০

নয়া বৌ ৪৩

নয়া বৌ

(এক)

আম্মা এক ভাবীকে আমার জন্য মেয়ে দেখতে বলেছেন। ভাবী এই দায়িত্ব পেয়ে মহাখুশি। খুশির কোনো অন্ত নেই। ভাবী আমারে চুপিচুপি ডাকল। আমি দোতলার বারান্দা থেকে হাত নেড়ে জানান দিলাম আছি।

মেয়ের ফটো দেখিয়ে বলল, এই তুই নিচে আয়। তোর সঙ্গে প্রাইভেট কথা আছে।

আমি একমুহূর্ত দেরি না করে সিঁড়ি ভেঙে তরতর করে নিচে নেমে এলাম। ইচ্ছে করছিল দোতলা থেকেই লাফ দিই। পরে ভাবলাম আমার কিছু হয়ে গেলে মেয়েটার কী দশা হবে!

ভাবী বলল, নাদিম দ্যাখ, মেয়ে ঠিক আছে কী না। আমি মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখলাম। নাহ, মেয়ে মাশাল্লাহ যথেষ্ট সুন্দরী। চুলগুলো বেশ বড়সড়। চোখদুটিও গরুর চোখের মতো টানাটানা। ঠোঁট দু'টি গোলাপের পাপড়ির মতো পিনপিনে। সবই তো ঠিক আছে ভাবী। দাঁত তো দেখলাম না। দাঁতের ছবি নাই? দাঁত বড় না ছোট। ইঁদুরের না বানরের দেখার বড়ই শখ জাগতাছে।

ভাবী ছবিটা আমার হাত থেকে বাজপাখির মতো ছুঁ মেরে নিয়ে বলল, এইটে আমার বোন। পছন্দ হয়েছে কী না আগে ক। দাঁত বিয়ের পরও দেখা যাবে। ওটা কোনো বিষয়ই না।

আমি নিরাশ হয়ে বললাম, পছন্দ হয়েছে। কিন্তু...

'কোনো কিন্তু টিন্তু নাই। পছন্দই সবচেয়ে বড় জিনিস। আমি তাহলে কথা পাকা করে ফেলি?'

'এখনই? পরিবারের আরও তো সদস্য আছে। ওদের সঙ্গে আলোচনা সমালোচনা করতে হবে না?'

'বিয়ে করবি তুই। পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করার দরকার কী? তা ছাড়া তোর ভাইকে যা বোঝানোর আমি গতকাল রাতেই বুঝিয়ে ফেলেছি।'

আমি একটু ট্যারা চোখে তাকালাম। তাকিয়ে বললাম, আয়হায়, তাহলে তো কাম আরেকটা হয়ে গেছে।'

'কী কাম?'

‘আপনে ভাইয়াকে যখনই কোনো বিষয়ে বোঝাতে যান তার কিছুদিন পরই আমাদের ভাইস্তে ভাস্তির আগমনের খবর-টবর চলে আসে। এই টেকনিকটা আমি আজও বুঝলম না ভাবী। কাহিনি কী?

ভাবী অন্য দিকে ফিরে ঠোঁটের কোণে দুষ্ট হাসি ঝুলিয়ে বলল, যাহ, দুষ্ট কোথাকার!’

পরদিন পাত্রীর বাড়ি থেকে দাদি শ্বাশুড়ি আমাকে দেখতে এলেন। বাজার-সদাই দেখে মনে হচ্ছে বিয়ে হয়ে যাবে হয়তো। আমি আমার রুমে অন্য দিকে ফিরে জামা আয়রন করছি। দাদি শ্বাশুড়ি দরজা ধরে দাঁড়িয়ে বললেন, ওগো নওশা, মুখটা একটু ফিরাও, তোমারে একটু দেহি।

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম।

‘ছেলে তো মাশাল্লাহ খুউব সুন্দর। আমগো নাতনির লগে মানাইব!’

হাতে পাঁচশ টাকার একটা ছেঁড়া, তেলতেলে নোট ও পাঁচ টাকার একটা শেখ মুজিব মার্কা কয়েন ধরিয়ে দিলেন। আমি নিতে চাচ্ছি না, জোর করে দিয়ে বললেন, মুরব্বিরা এইসব দিলে নিতে হয়। এটা হইল গিয়া মুরব্বিদের দুআ।

আমি কিছু বোঝার আগেই রুম থেকে বের হয়ে গেলেন।

এরকম দুআ কে না চায়! আমি বারবার দেখতে লাগলাম। দোয়ার এপিঠ-ওপিঠ। নাহ, জাল টাকা না। পাঁচশ টাকার রহস্য খুব সহজে বুঝতে পারলাম। কিন্তু পাঁচ টাকার রহস্য বুঝতে পারলাম না। থাক, সব কিছু বোঝার দরকারও নাই।

বিকেলে ভাইয়া বাসায় এল। হাত পেতে টাকা চাইল। আমি ওয়াক থু আওয়াজ করলাম। ভাইয়া দ্রুত হাত সরিয়ে ফেলল।

বললাম, ‘কীসের জন্য হাত পেতেছো?’

‘ট্যাকা দে।’

‘কীসের ট্যাকা?’

‘দুপুরে এক ভদ্রমহিলা তোরে জোর করে দিয়ে গেল যে, ঐ ট্যাকা। তাড়াতাড়ি দে।’

‘ঐ ট্যাকা আমি তোমারে দিমু ক্যান? আমারে দেখতে এসেছিল খুশি হয়ে দিয়ে গেছে।

বখশিশ দে কিছু ট্যাকা!

আমি মুখের ওপর বললাম, জি না ভাইজান।

‘দিবি না?’

‘নাহ!’

‘আরেকবার চাইব, দিবি না?’

‘একবার না বললাম, নাহ!’

‘বিয়ে তাইলে তুই একাই কর। আমিও নাই তোর ভাবীও নাই।

আম্মা_____ভাইয়া খালি কানের কাছে কী যেন বলে!

এই না না, থাম। আমি চলে যাচ্ছি। ছাগলের মতো আর ভ্যা ভ্যা করিস নে।

আম্মা ____

আম্মা রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল, এই কি হয়ছে তোদের? এত জ্বালাতন সহ্য হয় না। দুইজনকে কিন্তু ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেব, মনে রাখিস কইলাম!

ভাইয়া আর কোনো কথা বলল না। আমার দিকে ড্যাপড্যাপ করে তাকিয়ে, বিড়ালের মতো নিঃশব্দে চলে গেল।

আমি শব্দ করে হাহা করে হেসে উঠলাম।

আমি কখনো কোনো মেয়ের দিকে তাকাইনি। সামনে বসা যে মেয়েটি বসে আছে, সে আমার হবু বউ। হবু বউ বলা হয়তো ঠিক হচ্ছে না। এখনো আমাদের বিয়ে হয়নি। এরমধ্যে বউ বলার অধিকারও আমার নেই। তবে কথাবার্তা সব শেষ। সবাই দেখে ফেলেছে শুধু আমিই দেখিনি। বাসায় মন খারাপ করে বসে আছি দেখে দাদি এসে বলল, চল নাদিম, বউ দেখায়ে নিয়ে আসি, মন ভালো হয়ে যাইব। আমি উদাস হয়ে দাদিকে বললাম, দাদি, বৌ আমার অথচ আমিই দেখলাম না। হায়রে কপাল।

আমরা মুখোমুখি বসে আছি। কেউ কোনো কথা বলছি না। অনেক কিছু জিজ্ঞেস করব বলে ইয়া বড় লিস্ট জামার পকেটে রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু দাদি এত তাড়াহুড়ো করে নিয়ে এল যে, ওই জামাটাই পরতেই ভুলে গেছি। কী কী জিজ্ঞেস করব সবকিছু মনে মনে গুঁছিয়ে নিচ্ছি।

এমন সময় পেছন থেকে দাদিজান কানেকানে ফিসফিস করে বলল, এই গাধা, তুই তোর দাদার মতো ভিজে দরবেশ হলি কবে থেইক্কা? প্রথম যেদিন আমাকে তোর দাদা দেখতে এল। আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকাই রইলাম। মানুষটারে একপলক দেইখেই মনে ধরে গেল। ওনি একটাবারও তাকাল না দেখে আমার মনটা ভেঙে গেল। আঁচলে মুখ ঢেকে শব্দ করে কাঁদতে কাঁদতে বললাম, আমি বিয়েই বসব না!

আমার কান্না দেখে তোর দাদাজান অবাক হয়ে তাকাল। আমি সোফা থেকে উঠে বললাম, আমি একেই বিয়ে করব।

‘কী লজ্জার কথা, ক? নাদিম, এই নাদিম দ্যাখ না একটু! ‘

আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি। বুড়ী কী বলে! আমি তাকাই, সেও তাকায়। আমি চোখ বুঝে ফেলি সেও বুজে ফেলে। দুজন চুপচাপ বসে আছি। কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছি না। দাদিজান ওদের বাড়ির আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে এটা সেটা নিয়ে কথা বলছে। আমি এই ফাঁকে তাকিয়ে দেখি, সেও তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তেই দু'জনেই শব্দ করে হেসে উঠলাম!

দাদিজান বলল, তোরা নিজেরাই তো কাম সাইরে ফেললি। কবুলের জন্য আর আলাদা তোষামোদ করা লাগব না। যাক, বাঁচা গেল।

(দুই)

ফুলশয্যার রাত। মেহেরুন লম্বা ঘোমটা টেনে বসে আছে খাটে। নাদিম খাটের এক কোণে বসে বলল, বসতে পারি?

মেহেরুন নীচু স্বরে বলল, বসেই তো পড়েছেন আবার নতুন করে অনুমতি নেওয়ার কী আছে!

আমাকে কিছু বললেন?

'নাহ, আপনাকে না, আরেকজনকে বলেছি।'

নাদিম আশেপাশে চোখ ঘুরিয়ে আরেকটু কাছে আসার চেষ্টা করল। মেহেরুন মুচকি হেসে দূরে সরে গেল।

নাদিম বোকার মতো হাসতে হাসতে বলল, জীবনের প্রথম বিয়ে তো এজন্য একটু নার্ভাস লাগছে। এ নিয়ে তুমি চিন্তা কইরো না। দুয়েকবার বিয়ে করলে অবশ্য নার্ভাসনেসটা কেটে যাবে।

এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মেহেরুন সাপের মতো ফণা তুলে ফুস করে উঠল।

'কী কন, আপনে আরও বিয়ে করবেন? তৌবা তৌবা।

'না মানে... নার্ভাসনেসটা দূর করার জন্য চাইছিলাম আর কি!'

চারিদিকে পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে। দূরে কোথাও একটা রাত জাগা পাখি বিরামহীন ডেকে যাচ্ছে। ঘরের পেছনের পেয়ারার গাছটার ডাল ভেঙে পড়ার শব্দ হল।

মেহেরুনের একটু ভয় ভয় লাগল।

নাদিম বলল, মেহেরুন, আমি কি তোমার হাতটা একটু ধরতে পারি?

কপাল ভাঁজ করে বলল, ছি ছি, এসব কী বলছেন, মেয়ে লোকের হাত ধরা ঠিক না। আমি আপনারে কত ভালো ভাবতাম আর আপনি কী না...!

‘আজ তো ফুলশয্যার রাত। তাই ভাবছিলাম...’

মেহেরুন লাফ দিয়ে উঠে বলল, কী ভাবছিলেন? চাঁদের কথা? চাঁদ দেখতে যাবেন? চলুন, চাঁদ দেখে আসি?

নাদিম হাসি-হাসি মুখ করে বলল,

আপনি ঘরে থাকতে, আমি বাইরের চাঁদ দেখতে যাব কোন দুঃখে?

আহা, আপনি কত সুন্দর করে কথা বলেন।

আচ্ছা, আমাকে একটা গল্প শোনান। আমার না খুব ঘুম পাচ্ছে!

আজ তোমার ঘুম পাচ্ছে? আজ না আমাদের ফুলশয্যার রাত।

ওমা, এটা কেমন কথা! মানুষের কী ঘুম পেতে পারে না? তা ছাড়া আমি শুনেছি ফুলশয্যার রাতে জেগে থাকা মহাপাপ।

কে বলেছে?

আমি!

আমিটা কে?

আমি আপনি, আপনি আমি! হিহিহিহি।

দুজনেই হাসল।

মেহেরুন হাসি থামিয়ে বলল, একটা গল্প বলেন শুনি।

‘মাথায় কোনো গল্প নেই!’

‘তাহলে আমি ঘুমিয়ে পড়ি, হ্যাঁ?’

‘না না, বলছি___

একদেশে ছিল এক রাজা। রাজার একটা রাজকন্যা ছিল। দেখতে ভারী মিষ্টি। সেই রাজকন্যা দেখতে দেখতে হঠাৎ বড় হয়ে গেল। রাজা রাজকন্যাকে বিয়ে দিলেন পাশের রাজ্যের রাজকুমারের সঙ্গে। তারপর একদিন...

এই মেহেরুন, ঘুমিয়ে গেলে?

ডান হাতের উল্টো পিঠ মুখে রেখে লম্বা একটা হাই তুলে বলল, হুম।

তারপর শোন না কী হল!

শুনছি তো।

তারপর একদিন... আহা, আবার ঘুমিয়ে গেলে?

‘মেহেরুন কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আপনে এত কথা বলেন ক্যান, হ্যাঁ? আমারে একটু শান্তিতে ঘুমাতেও দিবেন না? ঘুমানোর জন্য বিয়ে বসতে রাজি হলাম। আর এখানে এসে ঘুমোতেই পারছি না। ঘুম বাদ দিয়ে সারারাত গল্প করে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে কন? কাল সকালে আপনার সব গল্প শুনব। এখন ঘুম পাচ্ছে, একটু ঘুমাই, প্লিজ?

মেহেরুন গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। নাদিম তার দিকে তাকিয়ে হাসল। জানালা গলে চাঁদের আলো এসে পড়ছে মেহেরুনের মুখে। ভীষণ মিষ্টি লাগছে তাকে। যেন একটা হালকা হাসি ওর চোখ-মুখ জুড়ে বিস্তৃত হয়ে আছে। ঘুমন্ত মেহেরুনকে এখন নাদিমের কাছে সেই গল্পের রাজকন্যার মতো লাগছে!

* * *